দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি স্মৃতি নির্ভর, বর্তমানে নকল নির্ভর ও সার্টিফিকেট সর্বস্ব। তত্ত্ব ও তথ্য সন্ধানী সমকালীন পরীক্ষা পদ্ধতি জাতীয় আখাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম। আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলোর দিকে তাকালে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) সকল স্তরের শিক্ষা থেকে আহরিত জ্ঞান নিরূপণ ও মূল্যায়ন, (২) উচ্চতর শিক্ষার অনুকূলে শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, সহজ বুদ্ধি ও শক্তি যাচাই, (৩) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের গতিধারা এবং কোন অবস্থায় তার প্রকৃত বিকাশ ঘটবে তা নির্ধারিত, (৪) সামাজিক কর্মে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার মূল্যায়ন, (৫) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও সনদপত্র বিতরণ।

আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনায় এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল পাওয়া যাবে না। বাস্তবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান লাভের পরিমাণ জানার কোন ব্যবস্থা নেই। নির্বাচিত কিছু প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে বা অন্য উপায়ে পরীক্ষার খাতায় তুলে দিতে পারলেই সুফলের পাওনাদার হওয়া যায়। এভাবে আর যা-ই হোক আধুনিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর দিকে তাকালে সকল দায়িত্ববান নাগরিকের মনে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও সন্দেহের সৃষ্টি না হয়ে পারে না। পুলিশ প্রহরাধীন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে পরীক্ষার্থীদের নকল করার বেপরোয়া অপপ্রয়াস, শত শত পরীক্ষার্থীর নকল করার দায়ে বহিষ্কার, অসদুপায় অবলম্বনে বাধা দিতে গিয়ে শিক্ষকের নাজেহাল, ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফলাফল সম্পর্কে কারচুপি, পর্দার অন্তরালে ভালো ফলাফলের প্রত্যাশায় বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলোর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, এমনি বহু ঘটনাবলী পরীক্ষা পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরীক্ষায় পাস-ফেল পদ্ধতিও সে ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশিক আমলের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। যদি কোন কারণে পরীক্ষার সময় কোন পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে বা কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বা অন্যকারণে মাত্র এক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় এবং অন্য সব বিষয়ে ১ম বিভাগীয় উচ্চ নম্বর পেলেও তাকে ফেল ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে দু'বছর লেখাপড়া, মুখস্থকরে পরীক্ষার একমাসে ঠিকভাবে উদগীরণ না করতে পারলেও সে অকৃতকার্য হবে।

এ অযৌক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে অহেতুক ভয়, আতংক ও হতাশার সৃষ্টি করে বলেই সে পরীক্ষার সময় বেপোরোয়া হয়ে উঠে এবং অসদুপায় অবলম্বন করতে প্ররোচিত হয়। এভাবে শিক্ষার্থীর তরুণ মনে জন্মলাভ করে অপরাধপ্রবণতা। অপরদিকে, দু'বছরের ফাঁকে পরীক্ষার কোন অনুশীলন তেমন থাকে না বিধায় ছাত্ররা লেখাপড়া ছাড়া ভিন্নপথে পা বাড়ার অবকাশ পায়। শ্রেণীকক্ষে বিস্তর সময় হাতে আছে ভেবে শিক্ষকের পাঠদানের দিকে মনোযোগী হবার প্রয়োজনবোধ করে না। শিক্ষকদের নিকট তাদের বরাবরই দাবী থাকে আগামী পরীক্ষালগ্নে কি কি প্রশ্নপত্রের মোকাবেলা তাদেরকে করতে হবে এ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য। শিক্ষকগণও ছাত্র-ছাত্রীদের মনোতুষ্টির জন্য কিছু কিছু প্রশ্নোত্তর আয়ত্ত করার পরামর্শ দিয়ে নৈতিক দায়িত্ব সমাপ্ত করার চেষ্টা নেন। এতে জ্ঞানলাভের পরিবর্তে পরীক্ষা পাসের ব্যবস্থা হয় বটে, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না।

অন্যদিকে, পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডসমূহের দায়িত্ব হলো এমন পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা লব্ধ জ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। তাদের প্রদত্ত সনদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এমনটি কোন কোন মহাবিদ্যালয়েও এ সনদপত্রের ওপর আস্থা হারিয়ে ভর্তি বাছাই পরীক্ষা চালু করেছে। তাই সংগতকারণেই প্রশ্ন উঠছে, এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে সনদপত্র প্রাপ্তির পরও যদি যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বাছাই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়, তবে কেন্ এ বৃথা প্রচেষ্টা? আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এ সনদপ্রাপ্তির জন্য পরীক্ষার ব্যয়ের কি স্বার্থকতা থাকতে পারে?

সামাজিক কাজে যোগ্যতার মূল্যায়ন আধুনিক পরীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি তত্ত্ব নির্ভর বিধায় সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের মতো ব্যবহারিক শিক্ষার দিকটি এখানে উপেক্ষিত। তাই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এ দু'ধারা শিক্ষার সু-সমন্বয়ের অভাব আমাদের শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনে অযোগ্য করে তুলেছে। ছাত্রসমাজ আমাদর সামগ্রিক সমাজ জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে তারা সমাজ ঠেনে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর মতো সমাজ গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ, ব্যবহারিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়া উচিত। তাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, সমাজও উপকৃত হবে। সুতরাং আধুনিক পরীক্ষার পদ্ধতির নীতি ও লক্ষ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে সাজাতে হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

(১) আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত বহিঃপরীক্ষার উপর জোর দেয়ার ফলে সত্যিকারের মেধাবী প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে আন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সু-সমন্বয়সাধন প্রয়োজন।

(২) মাধ্যমিক পর্যায়ে বছরে ৪টি পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। বার্ষিক পরীক্ষার সময় এ নম্বরগুলো যুক্ত করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বহিঃপরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। চূড়ান্ত ফলাফলের সময় মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলও যুক্ত করতে হবে।

(৩) সমাজকর্ম ব্যবহারিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এ কাজের যোগ্যতা নির্ণয় করে নম্বর দিতে হবে।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দুটো বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যেমনটি প্রাক-স্বাধীনতা সময়ে চালু হয়েছিল।

(৫) নকল প্রবণতা রোধকল্পে প্রশ্নের ধারা পরিবর্তন করে প্রচলিত রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র করতে হবে।

(৬) বিজ্ঞান বিভাগ, কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগ, বৃত্তিমূলক বভিাগ ও কৃষিসহ কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তঃপরীক্ষা, বহিঃপরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষার ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতির নৈরাশ্যজনক ও লজ্জাকর পরিস্থিতি জাতির জন্য চরম অবক্ষয়। প্রকৃত শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তা ছাত্রেরই হোক আর অভিভাবকেরই হোক ফিরিয়ে না আনতে পারলে এ দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান কিছুতেই সম্ভব নয়। সর্ব সমহলের সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারে এ পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে।

—মোঃ আবদুস সত্তার